শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ

ও

ভক্তিতত্ত্ব



(উপক্রমণিকা)



শ্রীঅটলবিহারী সিংহ।

প্রকাশক—
শ্রী অটলবিহারী সিংহ।
মেদিনীপুর।

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন বাক্‌চি।
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং'র
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস।
৩৮।১, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র।



পরম-স্নেহাস্পদ

শ্রীমতী ... ... দাসী।

স্নেহাস্পদেষু—

কল্যাণি!

আমার এই মরুময় জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে তোমার অভিনয় - আমার জীবনাকাশে, অমানিশার ঘোর অন্ধকারে তুমি ক্ষণপ্রভার ন্যায় একবার মাত্র বিদ্যুচ্ছটা বিকাশ করিয়া, আবার কোথায় অন্তর্হিত হইলে? বুঝিয়াছি—তুমি এই মর্ত্ত্যের জীব নও—তুমি স্বর্গের পারিজাত—এই মরুভুমি তোমার উপযুক্ত স্থান নয়! সংসারের ভীষণ তাপে তাপিত হইয়া, তোমার সুকোমল দেহখানি অকালেই বৃন্তচ্যুত শুষ্ক কুসুমের ন্যায় ঝরিয়া পড়িল,—তুমি যেখানের জীব, সেই-খানেই গিয়াছ! তোমার এই স্বল্পকালব্যাপী অভিনয়কালে আমি বুঝিতে পারিলাম না—**তুমি দেবী, কি মানবী!**

তোমারই ধর্ম্মজীবনের সহিত অনুস্যূত হইয়া, এই পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ে কথঞ্চিৎ ধর্ম্মবীজের অঙ্কুরমাত্র উপজাত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে, আমি এই 'শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিতত্ত্ব' রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহা শেষ করিবারও অবকাশ দিলে না! আজ এই গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। তাই তোমার সুকোমল করে আমার অনেক সাধের 'ভক্তিতত্ত্ব' অর্পণ করিলাম। তোমার সহিত এই গ্রন্থখানির স্মৃতি অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত। যদিও তোমার সহিত আজ আমার দেহ সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন, তথাপি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, উভয়ের আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে না! আবার তোমাকে পাইব—আবার তোমার সহিত মিলিত হইব—আবার তোমার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মজীবনের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র জীবন মিশাইয়া দিয়া, উভয়ে অনন্তের পথে ধাবমান হইব। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

—:*:—

আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ মহাশয়, তাঁহার প্রণীত "শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও ভক্তিতত্ত্ব" গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে কিছু লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। অটলবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাবুক লেখক। তাঁহার গ্রন্থে আমার লেখনী ধরিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি বন্ধুবাক্যের হেলনা করিতে পারি না।

অটলবাবু ভাগবত পুরাণের গভীর, হৃদয়ভেদী, সরস, রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ; তাই তিনি এই রহস্য-ভেদের অধিকার পাইয়াছেন।

মূর্খ রাবণ স্বর্গ নাই জানিয়াও স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিল—ত্রিশঙ্কু বিপথে গিয়া স্বর্গের দুয়ারেই উল্‌টাইয়া পড়িল—রাজ্যত্যাগ, পুত্রত্যাগ, পত্নীত্যাগ, সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্র অনায়াসে স্বর্গবাসী হইলেন। যজুর্ব্বেদ সকল যজ্ঞের কথা বলিয়া, অবশেষে সর্ব্ববিধ ত্যাগ-যজ্ঞের কথা বলিলেন। সে অনেক দিনের কথা! কিন্তু কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে কয়জন মনুষ্য যথার্থ ত্যাগপথের অবলম্বী।

তাহার পর স্বধর্ম্ম। সকলেরই এক নিজের ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্ম দ্বারা কেহ শিক্ষক বা ব্রাহ্মণ, কেহ রক্ষক বা ক্ষত্রিয়, কেহ ধর্ম্মবর্দ্ধক বা বৈশ্য, কেহ শ্রমসেবক বা শূদ্র। সকলেরই কর্ত্তব্য স্বধর্ম্ম দ্বারা সমাজের সেবা করে। এই সামাজিক সেবা দ্বারা সামাজিক বন্ধন হয় এবং সামাজিক একতা হয়। এই সামাজিক একতাই জাতীয় জীবনের মূল। এই জাতীয় জীবনের প্রবল আবেগে মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া গিয়া, জাতীয় স্বতন্ত্রভাব উপলব্ধি করে।

কিন্তু ত্যাগের ভিত্তির উপরই যথার্থ জাতীয় জীবন গঠিত হয়। মানবের প্রথম শিক্ষা ত্যাগের শিক্ষা! সে ত্যাগ কেবল বিদেশীয় আক্রমণের সময় নয়—সে ত্যাগ কেবল জাতীয় বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য নয়—সে ত্যাগ দৈনিক ত্যাগ—সে ত্যাগ নিত্য—পরস্পর ত্যাগ! সে ত্যাগে শিক্ষা-জীবী ও ধর্ম্মজীবী, অস্ত্রজীবী ও নন্দনজীবী, কৃষিজীবী ও বাণিজ্যজীবী, শ্রমজীবী ও অপেক্ষজীবী—সকলেই এক পরস্পর ভাবনা দ্বারা অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হয়। সে ত্যাগদ্বারা সমগ্র জাতি এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়।

প্রথমেই বলিয়াছি,—কয়জন মনুষ্য যথার্থ ত্যাগের শিক্ষা শিখিয়াছে? আবার বলিতেছি,—পৃথিবীর কোন্ ত্যাগে এখনও পর্য্যন্ত যথার্থ জাতীয় ভাবের বিকাশ হইয়াছে?

কিন্তু ঋষিগণ, আচার্য্যগণ, তাই বলিয়া নিরস্ত হন না। যদিও অত্যল্প-পরিমাণ মানব ত্যাগের শিক্ষায় ও জাতীয় শিক্ষায় যথার্থ ভাবে দীক্ষিত হন, তথাপি তাঁহারা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর—মধুর হইতে মধুরতর চিত্র লক্ষ্য স্বরূপে প্রকটিত করেন।

জাতীয় সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য মানবকে উদারতার চরম স্রোতে ভাসাইয়া দেয়।

দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা মনুষ্য ত্রৈলোক্যময় ও ত্রৈলোক্যগত-প্রাণ হইয়া পড়ে। সে ত তখন ত্রৈলোক্য-জীবনের অত্যাবশ্যক অংশে—সে ত তখন ত্রৈলোক্যের অভেদ-মূলক ভেদের চরম সীমায় উপনীত—আর সে তখন ত্রৈলোক্যের বন্ধনে থাকিবে কেন? ত্রৈলোক্য ত ব্যক্তিগত সকাম জীবন!

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদো নিরূপিতঃ।

ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ॥

ত্রিলোকী মধ্যে সকামতা-মূলক জীবগণের সংস্থাভেদ নিরূপিত হইয়াছে। মহর্লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অনিমিত্ত বা নিষ্কাম কর্ম্মের বিপাক।

ত্রৈলোক্যের উচ্চতম অধিকারী স্বর্গবাসী দেবগণ এই নিষ্কামতা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, দেবযান-মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকে উপনীত হন্।

আর কথায় কথায় চলে না। ত্রৈলোক্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দেবযান-মার্গে প্রবর্ত্তিত হওয়া এককথার কথা নহে। ব্যাসদেব বলিলেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবঃ স্যুঃ কুটীচক-বহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥"

ত্যাগে কুটীচক হইয়া পার্থিব বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হও। বহূদক বা পরিব্রাজক হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পূর্ণ দখল করিয়া, অন্তরীক্ষ লোককে জয় কর; পরে হংস হইয়া জল হইতে দুধের ন্যায়, অনিত্য হইতে নিত্যকে সর্ব্বদা নিষ্কাসিত কর এবং পরমহংস হইয়া সর্ব্বদা নিত্য সত্যে অবস্থিত হও; তবেত তুমি জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে।

বুদ্ধদেব বলেন—আত্মহারা হইয়া প্রথমে স্রোতে গা-ঢালা দিতে হইবে। ইহাই, **স্রোতাপত্তি**, তাহার পর **সকৃদাগামী**; তাহার পর **অনাগামী**—তাহার পর **অর্হৎ**। এই চারি অবস্থার পারে না আসিলে, তুমি অসেখ বা অশিষ্য হইতে পারিবেনা। তাহার পর **নির্ব্বাণ মুক্তি**।

জীবন্মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ দেবযান-মার্গে ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন দিয়া প্রথমে কুমার হইতে হইবে। কুমার অবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনের অবধি ও বিশ্বগত জীবনের আরম্ভ। কুমার প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। কুমার-সৃষ্টি এক অদ্ভুত সৃষ্টি।

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড-গত-জীবন, ব্রহ্মাণ্ডময় ভাব ও ব্রহ্ম-লোক বাস এবং হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।"

ব্রহ্মলোক পর ধাম নহে

তিনি তাঁহার নিজের পরম ধাম বৈকুণ্ঠের আভাস দিলেন। কুমারদিগের নিকট তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিলেন। জয় ও বিজয়,—দন্তবক্র ও শিশুপাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তাঁহার প্রিয় দ্বারপালদ্বয়কে তিনি তৃতীয় বার বধ করিলেন। অধিকারী মনুষ্যের জন্য এইবার বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইল। বৈকুণ্ঠে গিয়া অধিকারী মনুষ্য বিষ্ণুর পারিষদ হইতে লাগিলেন;

বিষ্ণুর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি মনে মনে করিলেন,—আমাকে কি চিরকালই মুকুট ধারণ করিয়া রাজা সাজিতে হইবে? আমাকে কি চিরকাল শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে রাখিয়া নিজ ঐশ্বর্য্যে, নিজ ভক্তগণের কাছেও বড় হইয়া থাকিতে হইবে? আমি কি ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া মধুরভাবে নিজগণের সহিত সমভাবে মিলিতে পারিব না?

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি যার প্রীত॥

আমাকে ঈশ্বর মানি আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ডাকে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি।
আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধ আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে হবে সেই মোর মন ॥”

এই প্রেম-ধর্ম্ম জগতের অত্যন্ত দুর্লভ ধর্ম্ম,—অথচ প্রেমে ভগবান্ অতি সন্নিকট। ঐশ্বর্য্যে, ধ্যানের অপেক্ষা,—যোগের অপেক্ষা। ঐশ্বর্য্যে, ক্রমের পর ক্রম। এবং সেই ক্রমের দৌড় বৈকুণ্ঠগমন। অকপট প্রেমে, কৃষ্ণ ভক্তের চির-অধীন। প্রেমই ধ্যান—প্রেমই যোগ—প্রেমই ক্রম-আরোহণ !!!

পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে
যোগজ্ঞানে কহিলে উপায়
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়
আমার ঐছে করিতে না যুয়ায়।

চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচার।

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাই যে সন্তোষ
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে খুটিনাটী
শুনি গোপীর বাড়ে আর' রোষ
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তাঁর,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।

এই গোপী-ভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠা! "চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ন করি নারি কাড়িবারে"—এই ভাব—এই জগতের সুদুর্লভ স্বার্থশূন্য আত্মহারা প্রণয়,—হয় কোথা হৈতে? তাই ভাগবত পুরাণের উপযোগিতা—তাই ভাগবত ধর্ম্মের উপযোগিতা—তাই কৃষ্ণতত্ত্ব জানার অত্যাবশ্যকতা!

অটল বাবু তাঁহার সরস লেখনী দ্বারা এই সকল বিষয় বিশদ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ যে পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মুখবন্ধ

—ঃ০ঃ—

আমার চল্লিশ-বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমার প্রথমা পত্নী অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার পর সাত বৎসর কাল আমি অপত্নীক অবস্থায় সংসারলীলা অতিবাহিত করি। আমার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ (তাহা পাঠক-বর্গের বিবেচ্য) জীবনের প্রায় শেষ অঙ্কে পুনরায় দ্বিতীয়-দার পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। তিনি কেবলমাত্র পাঁচবৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনিও ইহলীলা সংবরণ করেন। পাঠকবর্গ হয়ত, আমার জীবন-নাট্যের এই অভিনয়ের আখ্যায়িকায় বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমার করযোড়ে নিবেদন এই যে, আমার এই গ্রন্থ-প্রণয়ন সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল,—তাই এই আখ্যায়িকার অবতারণা,—তাই এই গ্রন্থখানি, তাঁহারই স্মৃতির সহিত বিজড়িত করিয়াছি! আশা করি, পাঠকগণ আমার অপরাধ ও ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

আমি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার পর দ্বিতীয়া পত্নীর উত্তেজনায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ

করি এবং তিনি জীবিত থাকা কালেই আমার ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন শেষ হয়। উক্ত পুরাণ পাঠ করিয়া, দাবদগ্ধ হৃদয়ে যে কি শান্তি উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা দুর্ব্বল-লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তৎকালে ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে, দুর্লভ মনুষ্য-জীবন-লাভ করিয়া, যদি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, বৃথায় জীবন-যাপন হইল। আমরা সংসারের কীট,—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাতেই অধীর,—শাস্ত্র পাঠে আমাদের স্বতঃই অনাস্থা; তাহাতে আবার শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সু-বৃহৎ ও দুরূহ গ্রন্থ। এই সংসারাশ্রমে থাকিয়া—সংসারের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া—এই গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপ পাঠ করা বা ইহার তত্ত্ব-হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুরূহ। তাই মনে হইয়াছিল—যদি কেহ সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় ইহার তত্ত্বগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া দেন, তাহা হইলে, মানবের পরম উপকার সাধিত হইবে।

এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমার দ্বিতীয়া পত্নীর অনুরোধে আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। আমার ন্যায় অযোগ্য অধিকারীর পক্ষে এই প্রয়াস, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবার যোগ্য; তথাপি যদি এই গ্রন্থের পাঠে একটি মাত্র মানবেরও কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনেক দিন হইল শেষ হইয়াছে।

এক্ষণে কেবল গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশটি পুস্তকাকারে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হইল। এই উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া, যদি পাঠকবর্গের নিকট উৎসাহ পাই, তাহা হইলে মূলগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াসী হইব।

আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও [illegible] তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া, এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ। ইতি—

মেদিনীপুর ১৩২৯ সাল।	বিনীত গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র ।

শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ত্ব



উপক্রমণিকা।

সমস্ত দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দুঃখবাদে পরিপূর্ণ—তাহাদের ভিত্তিমূল দুঃখ-বাদের উপরই গ্রথিত; এবং সমুদয় দর্শনেরই মতে, দুঃখ-হানিই জীবের পরম পুরুষার্থ;—দুঃখ-হানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। আত্যন্তিক দুঃখনাশই জীবের মুক্তি। ভিন্ন-ভিন্ন দর্শন-শাস্ত্র যে এই দুঃখনাশের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সম্যক্ আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, গীতাও সর্ব্বতোভাবে দুঃখবাদের অবতারণা করিয়াছেন;—গীতাও বলিয়াছেন যে, সংসার দুঃখময়,—সংসার ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের আলয়:—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।"

(গীতা ৮।১৫)

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"

(গীতা ৯।৩৩)

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।"

(গীতা ১২।৭)

"অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি"

(গীতা ৯।৩)

"জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্।"

(গীতা ১৩।৯)

"আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর দুঃখের আলয়ভূত ক্ষণভঙ্গুর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইতে হয় না।"

"অনিত্য ও অসুখকর এই লোক প্রাপ্ত হইয়া কেবল আমারই ভজনা কর।"

"এই মৃত্যু-গ্রস্ত সংসার-সমুদ্র হইতে আমিই তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি।"

"তাহারা আমাকে না পাইয়া এই মৃত্যু-পীড়িত সংসার-পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে।"

"জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখজনিত যে দোষ, তাহার অনুভূতি।" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি এই সংসারকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে করেন।

গীতাও এই ক্লেশ বা দুঃখের আত্যন্তিকতা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের উপায়

হইতে গীতোক্ত উপায়গুলি বিভিন্ন-প্রকার; অর্থাৎ দর্শনোক্ত উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কিছুই সম্বন্ধ নাই; কিন্তু গীতোক্ত উপায়ের কেন্দ্রস্থল ঈশ্বর। গীতার মত—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে পারিলেই, ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে পারা যায়; এবং তাহা হইলেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটি যোগের সহিতই ভক্তিযোগের সংযোগ করিতে হইবে; নচেৎ তাঁহাকে পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি-ব্যতিরেকে, তাঁহার মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। তবে ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

(গীতা ৭।১৪)

"এই গুণময়ী মায়া আমার দৈবী-প্রকৃতি; ইহা অতিশয় দুস্তরণীয়া। যিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।"

এই মায়ার প্রভাবেই জীবের অবিদ্যা-জনিত বন্ধন—এই মায়া অতিক্রম করিতে পারিলে, তবেই জীবের মুক্তি ও আত্যন্তিক সুখ। এই মায়া অতিক্রম করিতে হইলে, ভগবান্‌কে পাওয়া চাই। তাঁহাকে পাইবার বিভিন্ন পথ

বা মার্গের উল্লেখ করিয়া, গীতা সার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সকল পথেই কেবলমাত্র ভগবানে অচলা ভক্তি চাই। ইহাই গীতার সার মর্ম্ম। আদ্যন্ত গীতা পাঠ করিলে, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই ভক্তি-তত্ত্বই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। গীতা নানা স্থানে ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ;—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

(গীতা ৯।৩৪)

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

(গীতা ১০।৯)

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

(গীতা ১১।৫৪-৫৫)

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥"

(গীতা ১২।৬-৮)

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥"

(গীতা ৮।৭-৮)

"কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

(গীতা ৮।৯-১০

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥

(গীতা ৮।১৪)

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥"

(গীতা ৮।২২)

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

(গীতা ১৪।২৬)

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

(গীতা ১১।৫৪)

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

(গীতা ৯।২২)

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

(গীতা ৯।২৭)

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

(গীতা ৯।৩০-৩১)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥",

(গীতা ৯।৩৪)

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥"

(গীতা ১৮।৫৬)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীতা ১৮।৫৫)

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

(গীতা ১০।১০-১১)

"আমাতেই মন অর্পণ কর, আমারই ভক্ত হও, আমারই ভজনা কর, আমাকেই নমস্কার কর, আমারই সেবায় রত থাক—এই প্রকারে আপনার আত্মাকে আমার

সহিত যুক্ত করিতে পারিলেই, আমাকে প্রাপ্ত হইবে,—আমার সহিত মিলিত হইবে।”

“যাঁহারা মদ্গতচিত্ত, যাঁহারা আমাতেই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া, আমার গুণগান করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া দিয়া, পরম প্রীতি লাভ করেন, এবং অবশেষে নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।”

“হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি-দ্বারাই এবম্ভূত আমাকে স্বরূপতঃ দেখিতে ও জানিতে পারা যায়; এবং অবশেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। অতএব হে পাণ্ডব! যে আমার কর্ম্ম করিয়া থাকে,—আমিই যাহার পরম আশ্রয়,—যে আমার ভক্ত,—যে ভক্ত আসক্তিশূন্য এবং সর্ব্বভূতে বৈরভাব-বিরহিত, সেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

“যাহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্য-যোগ-সহকারে আমারই ধ্যান করে ও আমারই উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরে মৃত্যু-সঙ্কুল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি; কেন না, তাহারা কেবল মাত্র আমাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়াছে। অতএব তুমি আমাতেই তোমার মন সমর্পণ কর,—আমাতেই তোমার বুদ্ধি স্থাপন কর। তাহা হইলে তোমার দেহান্তে

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ও আমাতেই বাস করিতে পারিবে।"

"অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। কেন না, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিলে, নিঃসংশয়ে আমাকেই পাইবে। হে পার্থ! অভ্যাসযোগের দ্বারা যুক্ত হইয়া অনন্যগামী চিত্তের সাহায্যে দিব্যপুরুষকে চিন্তা করিলে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"যিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, পুরাতন, নিয়ন্তা, অণু হইতেও অণু, অতি সূক্ষ্ম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য-বর্ণ, তমসের পরপারে অবস্থিত পুরুষকে মৃত্যুকালে নিশ্চল-মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, যোগবলে আপনার ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণ-বায়ুকে সুস্থির করিয়া, ধ্যান করিতে পারেন, তিনিই সেই দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন।"

"যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্যই নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি নিরতিশয় সুলভ হইয়া থাকি।"

"হে পার্থ! যাঁহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত—চরাচর জগৎ যাঁহাতে অবস্থিত, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষকে কেবল একমাত্র অনন্য-ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।"

"আমাকে যে সাধক অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা

সেবা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইয়া থাকেন।”

“হে অর্জ্জুন! কেবল একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই সাধক এবম্ভূত আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।”

“যাঁহারা অনন্যচিন্তা দ্বারা আমার সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল নিত্যযুক্ত সাধকের যোগক্ষেম আমিই নিজ মস্তকে বহন করিয়া থাকি।”

“হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভক্ষণ কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমুদয়ই তুমি আমাকে অর্পণ করিও।”

“যদি নিরতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভক্তি হইয়া আমার ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধু বলিয়া গণনা করিতে হইবে। কেন না, তিনি সম্যক্ ব্যবসিত (শোভন অধ্যবসায়-যুক্ত) তিনি অচিরেই ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিরন্তর শান্তি উপভোগ করেন।”

“আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই যজন কর,—আমাকেই প্রণাম কর। এই প্রকারে মদেকপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইলে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।”

"আমাকে আশ্রয় করিয়া সকল কর্ম্ম করিলে, আমার প্রসাদে সনাতন অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইবে।"

"যিনি মোহবিনির্মুক্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বভাবে আমারই ভজনা করেন।"

"আমাতেই যিনি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ সংসার-দুর্গই অতিক্রম করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তিনি মায়াতীত হন।"

'তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব। তুমি শোক করিও না।"

"আমি স্বরূপতঃ যে প্রকারের, তাহা কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই জানা যায়। তৎপরে সাধক আমার স্বরূপ অবগত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন।"

"যে সকল সাধক সতত আমাতে অর্পিত-চিত্ত, এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া, আমি আত্মভাবে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া, উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করি।"

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে

যে, গীতা ভক্তিকেই মায়া-তরণের তরণীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ভক্তিকে নিরতিশয় মুখ্য স্থান প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞান, কর্ম্ম, ধ্যান-বিবর্জ্জিত ভক্তি নহে; পরন্তু, সেই ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধ্যান এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত। এই ত্রিবিধ যোগের সহিত ভক্তি অনুস্যূত। জ্ঞানী, জ্ঞানমার্গে বিচরণ করুন - কর্ম্মী কর্ম্মমার্গে বিচরণ করুন —যোগী ধ্যানমার্গে বিচরণ করুন; কিন্তু এই সকল মার্গেই অব্যভিচারণী ভক্তি চাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্ত সাধক বা ভগবদ্ভক্তই উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হন।

"তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

(গীতা ১১।১০)।

ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের অধিকারী; তিনি নিষ্কর্ম্মা নহেন—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

(গীতা ১১।৫৫)

আবার ভগবদ্ভক্ত ধ্যানযোগেও বিরত নহেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

(গীতা ৯।৩৪)।

"যে তু সর্ব্বাণি ক'   ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥"

(গীতা ১২।৬)।

অতএব গীতার অনুমোদিত ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্ম-ধ্যান-সমন্বিত ভক্তি।

এই ভক্তিতত্ত্ব অতিশয় জটিল—ইহার প্রকৃত মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই ভক্তিতত্ত্বের মূল বীজ বা অঙ্কুর উপনিষদে ;—দর্শনশাস্ত্রে ইহার অভাব—মহাভারতে, গীতাতে ইহা পল্লবিত। আবার আমরা যখন শ্রীমদ্ভাগবত বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিব, তখন দেখিতে পাইব যে, এই ভক্তিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে সর্ব্বতোভাবে প্রস্ফুটিতা। ভগবান্ যেমন সচ্চিদানন্দ, জীবও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ। প্রভেদ এই যে, জীবের 'সৎ'-ভাব, 'চিৎ'-ভাব ও 'আনন্দ'-ভাব অব্যক্ত। কিন্তু ভগবানের তাহা নহে। তাঁহার এই ভাবগুলি সুব্যক্ত। জীবের এই তিনটি ভাবকে ক্রমশঃ বিকসিত করিতে হইবে। জীবের যখন আনন্দময় ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবে - যখন তাহার আনন্দময় কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে,—তখনই নির্ম্মলা ভক্তির আবির্ভাব হওয়া সম্ভব। এই ভক্তির শিক্ষা—এই ভক্তির কথা,—এ যে আনন্দময় রাজ্যের কথা—এ যে স্থূল জগতের

কথা নয়। স্থূল জগতের ভাষায় ইহার প্রকৃত অভিব্যক্তি হইতে পারে না। তাই সময়-সময় আমরা ভ্রমপ্রমাদে পতিত হই—তাই আমরা অনেক সময়ে, পুরাণের প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে পারি না—এমন কি, বিকৃত অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার অঙ্কুর—উপনিষদে; ইহার অভাব—দর্শনে; মহাভারতে ইহার উন্মেষ;—এবং পরে দেখিব, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে ইহার পরাকাষ্ঠা। মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ কেবল মাত্র আখ্যায়িকা বা উপন্যাস বা কবির কল্পনা বলিয়া যেন মনে না হয়। আমরা বেদব্যাসের বাক্যেই দেখিতে পাই যে, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ **পঞ্চম বেদ** বলিয়া পরিগণিত।

"ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"

(ভাগবত ১।৪।২০)।

"ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত।" এবং আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সর্ব্ববেদের সার—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।"

(ভাগবত ১।৩।৪০)।

"এই ভাগবত পুরাণ ব্রহ্ম-সম্মত অর্থাৎ সর্ব্ববেদতুল্য।"

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতঃ॥

(ভাগবত ১।৩।৪১)।

'মহর্ষি বেদব্যাস, সর্ব্ববেদ এবং ইতিহাসের সার তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া আপন পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে এই ভাগবত পুরাণ উপদেশ দিয়াছিলেন।"

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যিনি লোক-পরম্পরায় যজ্ঞ প্রচলিত করিবার জন্য এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন—যাঁহার কৃপায় ইতিহাস-পুরাণাদি পঞ্চম বেদরূপে পরিণত হইল; যাঁহার কৃপায় মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্-গীতারূপ উপনিষদে, ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান-কর্ম্ম-ধ্যান-যোগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইল, সেই বেদব্যাসের কৃপাতেই, জগতে পঞ্চম বেদ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ আবিষ্কৃত হইল; সেই ভাগবত-পুরাণ-স্বরূপ কল্পবৃক্ষের ফল—ভক্তি !!! কিরূপ ভক্তি ?

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

(ভাগবত ১।৭।১০)

যাঁহারা আত্মারাম—যাঁহাদের হৃদয়-গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন

হইয়াছে, এবম্প্রকার মুনিগণ, উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন। হরির এমনই গুণ—।”

এই ভাগবত শাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রদায়ক বেদরূপ কল্প-বৃক্ষের ফল, শুক-মুখ হইতে গলিত হইয়া ধরণীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে।”

“নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলম্।
শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুতম্॥” (ভগবত ১।১।৩)

অতএব ভাগবত পুরাণ যে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এইবার দেখা যাউক ভাগবত ও ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে নৈমিষারণ্যে ঋষি-প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সূত কি বলিয়াছিলেন,—ঋষিরা প্রশ্ন করিলেন,—

“ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যান্যুত॥
যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যেচ মুনয়ঃ সূত পরাবর-বিদো বিদুঃ॥
বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥
তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্ বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতু মর্হসি॥

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥
ভূরীণিভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(ভাগবত ১।১।৬—১১)—

"হে সূত! তুমি মহাভাগবতাদি ইতিহাসের সহিত পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কেবল যে অধ্যয়নই করিয়াছ এমত নহে, সে সকলের ব্যাখ্যাও করিয়াছ এবং বিদ্বজ্জনগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবেদী অন্যান্য মুনিগণ যে সমস্ত শাস্ত্র বিদিত আছেন, হে সৌম্য! তুমি সেই সেই মহাত্মাদিগের অনুগ্রহে, তৎসমুদায় শাস্ত্রও যথার্থরূপে অবগত আছ; কেননা, গুরুগণ প্রেমবান্ শিষ্যকে অত্যন্ত গুহ্য বস্তুও বলিয়া থাকেন। হে সূত! হে চিরজীবিন্! তুমি সেই সেই শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা মানবদিগের অব্যভিচারী শ্রেয়ঃসাধন যাহা নিশ্চয় করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে বল। সাধারণতঃ এই কলিযুগে সকল লোকেই প্রায় অল্পায়ু; তাহাতে আবার আলস্য-পরায়ণ, নির্বুদ্ধি, বিঘ্নব্যাকুল এবং রোগশোকে উপদ্রুত। অতএব এই কলিযুগে মানববৃন্দের, বহুকালসাধ্য ভূরি ভূরি শ্রোতব্য শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা

শ্রেয়ঃসাধন নিশ্চয় করিবার সম্ভাবনা নাই এবং সেই সকল শাস্ত্রে বহুবিধ কর্ম্ম মানবগণের অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সারাসার নিশ্চয় করা সুকঠিন। অতএব হে সাধো! লোকদিগের মঙ্গলার্থ, এ বিষয়ে যাহা কিছু সার, তাহাই স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা উদ্ধার করিয়া বল, যাহাতে আমাদের বুদ্ধি প্রসন্ন হয়।"

এই প্রশ্নের উত্তরে সূত বলিতেছেন,—

"মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোক-মঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণ-সংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্॥

(ভাগবত ১।২।৫—৮)

"সূত প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিয়া ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—"হে মুনিসকল! আপনারা আমাকে উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। কেননা, কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন লোকের পরম-মঙ্গল-দায়ক; ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়।" তৎপরে সূত, প্রথম প্রশ্ন, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের সার ও

মানবের পরম মঙ্গল-জনক কি, এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে-ছেন,—"ধর্ম্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। ইহার মধ্যে যাহা স্বর্গাদিপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, তাহাই **অপর** এবং যাহা হইতে শ্রবণাদি-লক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই নিবৃত্তি-লক্ষণ **পর ধর্ম্ম** এবং সেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই মানবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ।"

এই নিবৃত্তিলক্ষণ পর-ধর্ম্মকেই সুস্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছেন,—"যাহা হইতে ফলাভিসন্ধান-রহিতা—এবং বিঘ্নকর্ত্তৃক অপ্রতিহতা, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম্ম—তাহাই পরম মঙ্গল। কেননা, তদ্দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি-নিহিত হইলে, আশু বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সে জ্ঞানে শুষ্ক তর্কাদি প্রবেশ করিতে পারে না। হে ঋষিগণ! যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় রতি না হয়, তাহা হইলে, উহা কেবল শ্রম মাত্র।"

ইহাই ঐকান্তিকী ভক্তি—ইহাই ভক্তিতত্ত্বের মূল সূত্র—এই তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা সূতবাক্যে আরও দেখিতে পাই,—

"বাসুদেব-পরা বেদা বাসুদেব-পরা মখাঃ।
বাসুদেব-পরো যোগো বাসুদেব-পরাঃ ক্রিয়াঃ॥

বাসুদেব-পরং জ্ঞানং বাসুদেব-পরং তপঃ।
বাসুদেব-পরো ধর্ম্মো বাসুদেব-পরা গতিঃ ॥"

(ভাগবত ১।২।২৮)

"অতএব মোক্ষ-প্রদত্ব হেতু বাসুদেবই ভজনীয়। সকল শাস্ত্রেরই এই তাৎপর্য্য। দেখ, বেদ সকল, বাসুদেব-পর, অর্থাৎ বাসুদেবেই তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য। এবং যজ্ঞ সকল বাসুদেব-পর; কেননা, তাহাতে তাঁহারই আরাধনা হয়। আবার—যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা এবং ধর্ম্ম, ইহাদেরও বাসুদেবে তাৎপর্য্য এবং বাসুদেবই পরম গতি।" অতএব সেই বাসুদেবে ভক্তিই পরম ভক্তি। তাই বলিয়া যেন আমাদের এরূপ ধারণা না হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল মাত্র অন্ধ ভক্তিরই প্রচার হইয়াছে, কেননা আমরা এই শ্লোকের অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাই, সেই বাসুদেবের স্বরূপ কি এবং তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব কি? একেবারে শ্রুতির পরম তত্ত্ব—বেদান্তের সার মর্ম্ম।

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥
তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতম্॥
যথা হ্যবহিতো বহ্নি র্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্‌॥
(ভাগবত ১।২।২৯—৩২)

"সেই ভগবান্‌ বাসুদেব প্রথমতঃ কার্য্যকারণাত্মিকা গুণময়ী মায়া দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিনি বিভূ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক এবং স্বতো নির্গুণ হইলেও সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত কখন কখন সগুণ হইয়া থাকেন। তাঁহার আত্মমায়ার দ্বারা আকাশাদি গুণসকল উৎপন্ন হইলে, তিনি তাহাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, ঐ সকল গুণ, "আমার অধীন," ইত্যাকার অভিমান করিয়া, গুণবানের ন্যায় প্রকাশ পান; কিন্তু বাস্তবিক তিনি গুণবান্‌ নহেন; তিনি চিচ্ছক্তিদ্বারা সদাই উর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। যেমন একই অগ্নি স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত হইয়া, কাষ্ঠাদির তারতম্য-ভেদে নানারূপে দৃষ্ট হন, তদ্রূপ বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ প্রাণীদিগের অন্তঃস্থিত হইয়া, যোনিগত তারতম্য-প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পান। সেই ভগবান্‌ স্বনির্ম্মিত, জরায়ুজ, অণ্ডজ, ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয় এবং মনোরূপ গুণময় ভাব দ্বারা, তাহাদের বিষয় সকল স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করেন।

তাঁহার ত স্বরূপ এই। তিনি ত নির্গুণ, নিরাকার, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ। তবে কি প্রকারে তাঁহার প্রতি

সসীম গুণবিশিষ্ট জীবের ভক্তির উদয় হইবে? এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য সূত সুত বলিতেছেন,—

"ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেব-তির্য্যঙ্-নরাদিষু॥

(ভাগবত ১।২।৩৩)

"লোক-ভাবন ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া, দেব-তির্য্যক্-নরাদিতে লীলাবশতঃ যে সকল অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুরক্ত হইয়া, লোক সকলের অন্তঃকরণে নানাভাব আবির্ভাব করিয়া দেন।

আমরা যখন শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন আমরা এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মীমাংসা করিব। উগ্রশ্রবা সূত এই প্রকার নানাবিধ অবতারের মূলসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ॥

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ॥
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥
তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষে র্ভূরিতেজসঃ।
অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥"

(ভাগবত ১।৩।৪০-৪৩)

হে ঋষিগণ! আমি আপনাদের সমক্ষে এই ভাগবত পুরাণ বলিতেছি। ইহা ব্রহ্ম-সম্মিত অর্থাৎ সর্ব্ববেদতুল্য। ইহাতে ভগবান্ উত্তম-শ্লোকের চরিত্র বর্ণিত আছে। মহর্ষি বেদব্যাস লোকদিগের মঙ্গলার্থে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন; অতএব ইহা সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রাপক এবং পরম মঙ্গল-জনক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে সমগ্র বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া, স্বীয় পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর তীরে ঋষিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগার্থ অনশনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন শুকদেব এই শাস্ত্র তাঁহাকে শ্রবণ করান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে, কলিযুগে সকল লোকেরই চক্ষু অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছিল; ঐ সময়ে এই পুরাণরূপ দিবাকরের উদয় হয়। হে বিপ্রগণ! বিপ্রর্ষি শুকদেব সেই স্থানে এই

পুরাণ আরম্ভ করিলে, আমি তাঁহার অনুগ্রহে তথায় নিবিষ্ট হইয়া তাহারই সকাশাৎ ইহা অবগত হইয়াছি। আমি যে প্রকার অধ্যয়ন করিয়াছি এবং আমার যাদৃশী বুদ্ধি, তদনুসারে আপনাদিকে শ্রবণ করাইব।”

এই স্থান হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সর্ব্ববেদাত্মক। মহর্ষি বেদব্যাস এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথমে আপন পুত্র পরমহংস শুকদেবকে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, এবং শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে, তাঁহার প্রায়োপবেশনকালে এই শাস্ত্র শ্রবণ করান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বধামে গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত সমগ্র ধর্ম্ম ও জ্ঞান অপসারিত হইয়াছিল; তাই কলির প্রারম্ভে ব্যাসদেব এই শাস্ত্রের প্রণয়ন করেন এবং মহাত্মা সূত সেই ভাগবত শাস্ত্র নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

তৎপরে সেই নৈমিষারণ্যে ঋষি-সংঘের মধ্যে ঋগ্বেদী শৌনক ঋষি মহাত্মা সূতকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন,—

‘কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ॥

(ভাগবত ১।৪।৩)

“হে সূত! কোন্ যুগে এই ভাগবত কথা-প্রবৃত্ত

হয়? মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতাদি ভূরি ভূরি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আবার কি কারণে ভাগবতী সংহিতা প্রণয়ন করিলেন? এ বিষয়ে তাঁহার প্রবর্ত্তক কে? এবং কোন্ স্থানেই বা ইহা সংগ্রহ করেন?"

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে অতি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। ত্রেতাযুগের অবসানে দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে, পরাশর ঋষির ঔরসে, বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে মহাযোগী বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি অতি প্রত্যূষে সরস্বতী নদীর পবিত্র সলিলে স্নানাদি সমাপন করিয়া, শুচি হইয়া বদরিকাশ্রমে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। তৎকালে ঋষিবরের অন্তরে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইয়াছিল। তিনি অতীত ও অনাগতদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ। কালের গতিবশতঃ পৃথিবীতে যুগধর্ম্মে ব্যতিক্রম উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের মঙ্গল সাধন কি প্রকারে হয়। অনেক চিন্তার পর, লোকপরম্পরায় যজ্ঞ প্রচলিত করিবার জন্য তিনি এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিলেন। এই চারি ভাগকে, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত হইল।

পূর্ব্বে অতিশয় মেধাবী লোকে বেদসকল ধারণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোক সকল তাহা যেরূপে ধারণ করিতে পারে, তদ্রূপেই বেদব্যাস বেদসকল সংগ্রহ করিলেন এবং স্ত্রী-শূদ্রাদির জন্যও মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন। এইরূপ সাধারণ হিতকর কার্য্যের দ্বারা জীবদিগের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও বেদ-ব্যাসের হৃদয়ে শান্তির উদ্ভব হইল না। তখন একদিন অতিশয় অপ্রসন্ন-মনে সরস্বতী নদীর তীরে নির্জ্জন স্থানে শুচি হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক মনের অপ্রসন্নতার হেতু কি, এই বিষয়ে বিতর্ক করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি উত্তম-রূপে ব্রত ধারণ করিয়া, বেদ, অগ্নি ও গুরু ইঁহাদের যথো-চিত পূজা করিয়াছি এবং অকপটে তাঁহাদের অনুশাসন গ্রহণ করিয়াছি ; আর মহাভারত রচনাচ্ছলে লোকহিতার্থ বেদার্থও প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার দ্বারা স্ত্রী-শূদ্রাদিও ধর্ম্মাদি দেখিতে পাইবে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! তথাপি আমার আত্মা বস্তুতঃ সেই সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও, হীনরূপে প্রকাশিত হইতেছে! এ প্রকার কেন হয়? পরমহংস-প্রিয় যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহা বাহুল্যরূপে নির্দ্ধারণ করি নাই, তাহাতেই কি মনের অসন্তোষ হইতেছে। ফলতঃ তাহাই ভগবানের প্রিয়।"

বেদব্যাস যখন এইরূপে বিবিধপ্রকারে আপনাকে হীন

বোধ করিয়া খেদ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার আশ্রমে মহর্ষি নারদ সপ্তস্বর-সমন্বিত দেবদত্ত বীণায় মুর্চ্ছনাপূর্ব্বক হরিকথা গান করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। দেব-পূজ্য নারদকে দেখিয়া বেদব্যাস সহসা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। তখন নারদ সমীপোপস্থিত বেদব্যাসের প্রতি অবলোকনপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন,—

"পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা॥
জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতম্॥
জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥

(ভাগবত ১।৫।২-৪)

"হে পরাশর-নন্দন! হে মহাভাগ্যবান্ বেদব্যাস! তোমার শরীরাভিমানী আত্মা শরীর দ্বারা এবং মনোভি-মানী আত্মা মনের দ্বারা পরিতুষ্ট আছে, যে সকল ধর্ম্মাদি জানিবার জন্য তোমার ইচ্ছা ছিল, বোধ হয় সে সকল তোমার সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, তুমি সর্ব্বধর্ম্ম-পরিবৃংহিত অতি অদ্ভুত মহাভারতা-খ্যান বর্ণন করিয়াছ। আর নিত্য ব্রহ্মের যে স্বরূপ, তাহাও

তুমি বিচার করিয়াছ এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। তথাপি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় বোধ করিয়া কি জন্য শোক করিতেছ ?”

নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদব্যাস কহিলেন, —“আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সুসম্পন্ন বটে, তথাপি আমার চিত্ত যে কেন প্রসন্ন হইতেছে না, ইহার কারণ নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি ব্রহ্মার সন্তান এবং মহাবুদ্ধিমান্; অতএব আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, ইহার কারণ বলুন।” তখন মহর্ষি নারদ বলিলেন,—

“ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥

(ভাগবত ১।৫।৮-৯)

বেদব্যাসের এইরূপ প্রার্থনা জানিয়া নারদ কহিলেন, —“তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ প্রায় বর্ণন কর নাই। ভগবানের যশোবর্ণন ব্যতিরেকে, কেবল ধর্ম্মাদি আচরণ করিলে, তাহাতে তাঁহার পরিতোষ হয় না। অতএব ভগবদ্‌যশোবর্ণন বিনা যে ধর্ম্মাদি জ্ঞান, তাহাই তোমার ন্যূনতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বকৃত গ্রন্থে যেমন ধর্ম্মাদির

কীর্ত্তন করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ প্রধান-ভাবে বর্ণন কর নাই।"

তাই মহর্ষি নারদ বেদব্যাসকে উপদেশ দিলেন,—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধ-মুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্‌বিচেষ্টিতম্॥"
(ভাগবত ১।৫।১৩)

"হে মহাভাগ বেদব্যাস! তুমি যথার্থদর্শী, নির্ম্মল-যশস্বী, সত্যপরায়ণ এবং শমদমাদি ব্রত ধারণ করিয়াছ; এখন মায়াবন্ধ-বিমোচন-নিমিত্ত, একাগ্রচিত্তে উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক বর্ণন কর।"

আমরা নারদ-বচনে আরও দেখিতে পাই,—

"ততোহন্যথা কিঞ্চন যদ্‌বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃত-রূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপিচ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহত-নৌরিবাস্পদম্॥
জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেহনুশাসতঃ
স্বভাব-রক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥

বিচক্ষণাঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো।
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্র মভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কো বিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা।
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনা ব্রজে-
ন্মুকুন্দ-সেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥
ইদংহি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধ-সম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥

ত মাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমস্তি নঃ কলাম্॥
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তৎ
মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্॥
ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভিনিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥

(ভাগবত ১।৫।১৪-২২)

উরুক্রম ভগবানের লীলা হইতে পৃথগ্‌দর্শী হইয়া প্রকারান্তরে যদি অন্য কোন অর্থান্তর বর্ণন করিতে ইচ্ছাকর, তাহাহইলে তোমার মতি বিবক্ষিত রূপনামে অবস্থিত হইয়া, বায়ুদ্বারা ঘূর্ণ্যমান নৌকার ন্যায় কখনও কোন বিষয়ে স্থিরতর স্থান প্রাপ্ত হইবে না॥ অতএব হে ব্যাস! তুমি হরিযশঃপ্রাচুর্য্য বর্ণনা ভাবাদিতে যে ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছ, তাহা তোমার অকিঞ্চিৎকর; প্রত্যুত বিরুদ্ধই হইল। কারণ স্বভাবতঃ কাম্য কর্ম্মাদিতে অনুরাগী পুরুষের পক্ষে তুমি নিন্দনীয় কাম্য কর্ম্মাদিই ধর্ম্মার্থে অনুশাসন করিয়াছ, ইহাতে তোমার মহা অন্যায় হইয়াছে; যেহেতু তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, ইতর ব্যক্তিগণ কাম্য কর্ম্মাদিকেই মুখ্যধর্ম্মরূপে স্থির করিবে। তত্ত্বজ্ঞেরা

বা তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও আর মানিবে না। বিচক্ষণ বা অতি নিপুণ কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বক্রিয়া-নিবৃত্তির দ্বারা অনন্তপার বিভু পরমেশ্বরের নির্বিকল্পসুখ-স্বরূপ জানিতে পারেন, কিন্তু অবিচক্ষণের তাহা জানিবার উপায় নাই। অতএব সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা প্রবৃত্ত দেহাভিমানী জনকে ভগবানের লীলা দর্শন করাও। স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক হরিচরণাম্বুজ ভজন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি অপক্ক দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার কি কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ নিমিত্ত অমঙ্গল অর্থাৎ নীচ যোনি প্রভৃতিতে জন্ম লাভ হয়? কদাপি হয় না; আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে এই তত্ত্বের আভাস পাই—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥" (১৮।৬১

আর হরিচরণারবিন্দের ভজন ব্যতিরেকে কোন স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থলাভ করিয়াছে? ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ও নিম্নে স্থাবরলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই নিমিত্ত যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বৈষয়িক সুখ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ যথাকালে চেষ্টা ব্যতীত ও দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্রই লাভ হইয়া থাকে। মুকুন্দসেবী জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কু-যোনি গত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় কদাচ সংসার প্রাপ্ত হয়েন না

কারণ রসগ্রহ হওয়াতে, মুকুন্দ-চরণারবিন্দের আলিঙ্গন-লব্ধসুখ স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার আর সেই চরণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই বিশ্বই ভগবান্—তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন ; কিন্তু বিশ্ব তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়। যেহেতু ভগবান্ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে। হে বেদব্যাস! তুমি ত এ সমুদায়ই জ্ঞাত আছ, তথাপি তোমাকে একদেশ মাত্র শ্রবণ করাইলাম। হে অমোঘদর্শিন্! পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশস্বরূপ আত্মা অজ হইলেও জগতের মঙ্গলসাধন জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা তুমি স্বয়ং জান ; অতএব মহানুভব ভগবানের পরাক্রম অর্থাৎ লীলা অধিকরূপে নিরূপণ কর। { ঠিক এই তত্ত্বই ভগবান্ গীতাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

(গীতা ৪।৬) }]

উত্তমশ্লোক হরির যে গুণানুবর্ণন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাহাকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দান, এই সকল কর্ম্মের নিত্যফল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

নারদ বেদব্যাসকে এই গুহ্য উপদেশ প্রদান করিয়া,

তিনি যে পূর্ব্বজন্মে বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর পুত্র ছিলেন, এবং সাধুসঙ্গ-বশতঃ, বাল্যচাপল্য এবং বাল্য-ক্রীড়া ও লোভাদি-বর্জ্জনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া,প্রতিনিয়ত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার যে শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রেম ও রতি উপজাত হইয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিলেন। অনন্তর তিনি এইরূপে দৃঢ়-ভক্তি-সম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধান্বিত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যোগীদিগের অনুচর হইয়া বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল যোগিগণ কৃপাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে গুহ্যজ্ঞানও প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণনা করিলেন। এই প্রকারে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করায়, তাঁহার আধ্যাত্মিকাদি পাপত্রয়ও বিনষ্ট হইয়াছিল।—নারদ এই কথা বলিয়া অবশেষে বেদব্যাসকে আদেশ করিলেন,—

"ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভো!
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশ-নির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা॥"

(ভাগবত ১।৫।৪০)

"হে ব্যাসদেব! তুমি মহাযশস্বী বিভু পরমেশ্বরের যশঃ প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, তাহাতেই পণ্ডিত সকলের বুভুৎসা অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা সমাপ্ত হয়। তদ্ব্যতীত বারংবার

দুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীবসকলের ক্লেশ নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া নারদ তৎপরে আপনার জন্ম ও কর্ম্মসকল বেদব্যাসের নিকট বর্ণন করিলেন ও কি প্রকারে যে তাঁহার ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়াছিল, তাহাও যথাযথরূপে বর্ণন করিলেন। তৎপরে যথাকালে তাঁহার প্রাক্তন দেহ ত্যাগ হওয়ায়, তিনি ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং প্রলয়াবসানে, ভগবান্ যখন যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহারও পুনরায় জন্ম হইল। তদবধি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে, তিনি ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহ্যে পর্য্যটন করেন—কোন স্থানেই তাঁহার গতির ব্যাঘাত নাই। তিনি স্বরব্রহ্মে অর্থাৎ সপ্তস্বরে দেবদত্ত বীণার মূর্চ্ছনা পূর্ব্বক হরিগুণ গান করিতে করিতে সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি বেদব্যাসের সমক্ষে আরও গুহ্য হইতে গুহ্যতম সত্য প্রকটিত করিলেন।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

(ভাগবত ১।৬।৩৫)

"নিয়ত কাম লোভে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি, মুকুন্দ-সেবা দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ শমতা প্রাপ্ত হয়, যম-নিয়মাদি যোগপথ দ্বারা আত্মার তদ্রূপ শান্তি হন না।"

বাসবীনন্দন বেদব্যাসের সহিত এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারদ বীণাযন্ত্রে হরিকথা গান করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

"এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ॥
(ভাগবত ১।৬।৩৭)

নারদ অন্তর্হিত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস যাহা কহিলেন, তাহা আমরা ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে সম্যক্ অবগত হইতে পারি—

"ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ॥

(ভাগবত ১.৭।২৮)

ব্রহ্মনদী সরস্বতীর প্রসিদ্ধ পশ্চিম তীরে, ঋষি সকলের যজ্ঞবৃদ্ধিকর শম্যাপ্রাস নামে যে প্রসিদ্ধ আশ্রম আছে, বদরীবৃক্ষ-সমূহ-শোভিত সেই আশ্রমে ভগবান্ বেদব্যাস উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সমাধি দ্বারা ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। ভক্তিযোগ দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত সম্যক্‌-রূপে সুস্থির হইলে, প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুষ, তদনন্তর তদধীনা মায়া, তাঁহার দর্শনগোচর হইলেন। অপর যে মায়ায় সংমোহিত জীবসকল স্বয়ং জ্ঞানাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে, এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও দেখিতে পাইলেন। অপিচ অধোক্ষজ ভগবানে যে ভক্তিযোগ করিলে, অনর্থের উপশম হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল। এই সকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া, অজ্ঞ লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন। এই সংহিতা শ্রবণ

করিলে, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে, শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্না হয়। তিনি এই সংহিতা রচনা করিয়া, এবং যথাক্রমে ইহার শ্লোক সকল সংশোধিত করিয়া, বিষয়-তৃষ্ণারহিত স্বপুত্র শুকদেবকে প্রথমতঃ অধ্যয়ন করাইলেন।"

এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, উপনিষদে ভক্তিতত্ত্বের বীজ বা অঙ্কুর ,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।"

(শ্বেতাশ্বতর উপ)

গীতাতে ইহার উন্মেষ ;—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদবাক্যে ইহার অবসান ;—

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
তত্র বাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥

(ভাগবত ১।৫।৩৪)

"যে সকল কর্ম্ম মনুষ্যদিগের সংসারের হেতু হয়, তৎসমস্ত পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে, আত্মবিনাশের অর্থাৎ কর্ম্মনিবৃত্তির নিমিত্ত সামর্থ্য হয়।"

ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পিত হইলে, তদ্দ্বারা প্রথমতঃ মহৎ-

সেবায় প্রবৃত্তি, তৎপরে মহৎদিগের কৃপা, তদনন্তর তাঁহাদের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা জন্মিলে ভগবৎকথা-শ্রবণেচ্ছা, তাহার পর ভগবানে রতি, ঐ রতির দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহের জ্ঞান, তাহার পর ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, তদনন্তর ভগবৎ-কৃপায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভগবদ্‌গুণের আবির্ভাব হয়। এইরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার ভক্তির ক্রম, শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অনুমোদিত।

"অত্রচ প্রথমং মহৎসেবা। ততস্তৎকৃপা, ততস্তদ্ধর্ম্ম-শ্রদ্ধা। ততো ভগবৎকথাশ্রবণম্। ততো ভগবতি রতিঃ। তয়াচ দেহদ্বয়-বিবেকাত্মজ্ঞানম্। ততো দৃঢ়াভক্তিঃ। ততোভগবত্তত্ত্বজ্ঞানম্। ততস্তৎকৃপয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভগবদ্-গুণাবির্ভাবঃ—ইতি ক্রমো দর্শিতঃ।"

আমরা যথাস্থানে মহর্ষি নারদের ভক্তিসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উপস্থিত এই স্থানে নারদ-বাক্যেই আমরা এই ভক্তিতত্ত্বের উপক্রমণিকার উপসংহার করিতাম; কিন্তু পুরাণের কালনির্ণয় ও বিষয়-নির্ণয় না করিয়া উপক্র-মণিকার শেষ করিলে, ইহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। তাই আমরা এই দুইটি বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করিয়া এই উপক্রমণিকার উপসংহার করিব।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের অংশ এবং ইহা উপ-নিষদ্ ও যোগশাস্ত্র—ইহা আমরা গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের

অন্তে দেখিতে পাই—"ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে…" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত যে পারমহংস্যসংহিতা—তাহাও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তে নিবিষ্ট আছে দেখিতে পাই—"ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াম্…" ইত্যাদি। এই উভয় শাস্ত্রই পরম যোগী বেদব্যাসকর্ত্তৃক প্রণীত। এই উভয় শাস্ত্রে কোন প্রকার মতদ্বৈধ থাকিতে পারেনা। আপাত-দৃষ্টিতে যাহা মতদ্বৈধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা বস্তুতঃ সত্য নহে। স্থিরভাবে আলোচনা করিলে, আমরা উভয় শাস্ত্রেই একই সত্য নিহিত আছে দেখিতে পাই। গীতাতে উপনিষদের সহিত ভক্তিতত্ত্ব অনুস্যূত—ভাগবতে ভক্তি-তত্ত্বেরই প্রাধান্য।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অন্ধভক্তির প্রণোদক বলিয়া দোষারোপ করেন এবং ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে দোষারোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ চিন্তার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁহারা পুরাণের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম। পুরাণের ভাষা ও মর্ম্ম অধিকাংশস্থলে অতিশয় জটিল। তাহাতে যে সকল কথার অবতারণা আছে, তাহা অধিকাংশস্থলে মনোময় রাজ্যের অতীত-আনন্দময় রাজ্যের কথা—তাহা স্থূল জগতের ভাষায়

সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুরূহ। মানবের মধ্যে যখন প্রকৃত পক্ষে আনন্দময় কোষের বিকাশ হয়, তখনই আমরা আনন্দময় জগতের কথা বুঝিতে পারি। নচেৎ সে রাজ্যে প্রবেশ করিবার আমাদের অধিকার নাই। তবে আমরা আর্য্য ঋষিগণের বংশধর; আমাদের ধমনীতে ধমনীতে সেই আর্য্যঋষিগণের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি দোষারোপ করি, অথবা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্কের লেপ অর্পণ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের জীবনে ধিক্। মহামুনি বেদব্যাস পরমযোগী; তিনি বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের অন্তর্গত গীতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থপ্রণয়নে পরিতৃপ্ত না হইয়া, ভক্তচূড়ামণি নারদের উপদেশে, এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, যাহা পরমহংসগণের অতিশয় আদরের জিনিষ, তাহাই প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পারমহংস্যসংহিতা বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর, তিনি, প্রথমতঃ এই পুরাণ আপন পুত্র মহাযোগী পরমহংস শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান এবং তিনিও যথাসময়ে পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট, তাঁহার প্রায়োপবেশনকালে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতীরে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। এই সকল কথা স্মরণ করিলে, কোন্ ব্যক্তি এরূপ মন্দমতি

আছেন, যিনি এই শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন? উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ লীলা বর্ণন করাই এই ভাগবতগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পবিত্র হইতে পবিত্রতম। কিন্তু আমরা এক্ষণে এরূপ হীনদশাপন্ন যে, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতেও পরাঙ্মুখ হই না।

হা ভগবন্! হা ঋষিগণ! আর কেন? আমাদের মত হতভাগ্য জাতির মধ্যে হইতে ভাগবত পুরাণ অপহৃত করিয়া লও! আমরা এক্ষণে এই ভাগবত পুরাণের অধিকারে সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত। বেদের অধিকাংশই আমাদিগের নিকট হইতে অপহৃত করিয়াছ—অধিকাংশ পুরাতন শাস্ত্রই প্রায় লোপ হইয়াছে। এখন এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের প্রতিমাস্বরূপ ভাগবত পুরাণও অপসারিত কর। যতদিন আমরা উপযুক্ত না হই—যতদিন আমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র না হয়,—ততদিন যেন ভাগবতগ্রন্থের প্রচার আমাদের মধ্যে না থাকে। আমাদের অন্তঃকরণ এখনও পাপপঙ্কে মলিন—আমরা এখনও নরকের কীট—আমরা কি প্রকারে সেই নির্ম্মল ও পবিত্র কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইব? আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের এই পাপপঙ্কিল ভাবের দ্বারা পাপের চিত্রই দর্শন করিয়া থাকি। নচেৎ আমরা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে

কলঙ্কারোপ ও ভাগবতগ্রন্থে দোষারোপ করিতে সাহসী হইব কেন? তাই বলিতেছি,—ভাগবত শাস্ত্র পাঠ করিতে হইলে, অন্তঃকরণ পবিত্র হওয়া চাই—আমাদের আনন্দময় কোষের বিকাশ হওয়া চাই। নচেৎ ভাগবত পাঠ বিফল ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

এইবার দেখাযাউক কাল নির্ণয়। কল্পের ইতিহাসই পুরাণ নামে অভিহিত এবং ব্রহ্মার একদিনের নাম এক কল্প। এককল্পে এক সহস্র মহাযুগ থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে এক মহাযুগ হয়। আমাদের একবৎসরে দেবতাদের একদিন হয়। দেবতাদের একবৎসরে আমাদের ৩৬০ তিনশত ষাইট বৎসর হয়। এককল্পে একসহস্র মহাযুগ ও চৌদ্দটি মন্বন্তর হয়। অতএব প্রত্যেক মনুর কাল ৭১$\frac{৩}{৭}$ মহাযুগ।

"স্বং স্বং কালং মনুর্ভুংক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্।"

(ভাগবত ৩।১১।২৪)

এককল্প ব্রহ্মার একদিন; আবার এই এক কল্প-পরিমিত কাল তাঁহার একটি রাত্রি। এইরূপ ৩৬০ দিবা ও রাত্রিতে, তাঁহার একবৎসর। এইরূপ শত বৎসর তাঁহার পরমায়ু। এই ব্রহ্মার কাল-পরিমাণ। এই কাল-পরিমাণকে "দ্বিপরার্দ্ধ" কাল বলে। ব্রহ্মার জীবনে এক পরার্দ্ধ কাল অতীত হইয়াছে। আমাদের এই কল্প দ্বিতীয় পরার্দ্ধের

আদি কল্প। এই কল্পের নাম "বরাহ" কল্প। বরাহ কল্পের ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে; এখন সপ্তম মনুর অধিকার কাল। তাঁহার নাম বৈবস্বত মনু এবং এই মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত-মন্বন্তর। বৈবস্বত-মন্বন্তরে ২৮ সত্য যুগ, ২৮ ত্রেতাযুগ, ২৮ দ্বাপর যুগ অতীত হইয়াছে। এখন অষ্টাবিংশতিতম কলি যুগ বর্ত্তমান। আমরা নিম্নে একটি তালিকা দিলাম; ইহা দ্বারা কাল-নির্ণয় পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

ব্রহ্মার পরমায়ূ
১০০ বৎসর।

দিবা এককল্প	রাত্রি এককল্প
=৪৩২,০০,০০,০০০	=৪৩২,০০,০০,০০০
মানব বৎসর	মানব বৎসর

৮৬৪,০০,০০,০০০
=ব্রহ্মার দিবারাত্র।
এইরূপ ৩৬০ বৎসরে
ব্রহ্মার এক বৎসর।
এইরূপ ১০০ বৎসর
তাঁহার পরমায়ু।

দেবমানে যুগের পরিমাণ।

	সন্ধ্যা	যুগকাল	সন্ধ্যাংশ	সমষ্টি
সত্যযুগ	৪০০	৪০০০	৪০০	৪৮০০
ত্রেতাযুগ	৩০০	৩০০০	৩০০	৩৬০০
দ্বাপর যুগ	২০০	২০০০	২০০	২৪০০
কলিযুগ	১০০	১০০০	১০০	১২০০
				১২০০০

এককল্পে এক সহস্র মহাযুগ।

অর্থাৎ এক কল্পে

১২০০০ × ১০০০ = ১২০,০০,০০০ দেব বৎসর

= ১২০,০০,০০০ × ৩৬০ = ৪৩২,০০,০০,০০০ মানব বৎসর

এককল্পে ১৪ মন্বন্তর

এক মন্বন্তরের পরিমাণ কাল

$$= \frac{১২০,০০,০০০}{১৪} = ৮৫৭১৪২\frac{৬}{৭}$$ দেব বৎসর

এক মন্বন্তর $\frac{১০০০}{১৪} = ৭১\frac{৩}{৭}$ মহাযুগ

এখন দেখা যাউক, পুরাণের বিষয় কি? আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেই এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

পুরাণ—কল্পের ইতিহাস।

(১) সর্গ (২) বিসর্গ (৩) স্থান (৪) পোষণ (৫) উতি (৬) মন্বন্তর (৭) ঈশানুকথা (৮) নিরোধ (৯) মুক্তি (১০) আশ্রয়।

(১) সর্গ=তত্ত্বসৃষ্টি বা উপাদানসৃষ্টি।

(২) বিসর্গ—চরাচর জীব সৃষ্টি।

(৩) স্থান—সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন করিয়া উৎকর্ষ বিধান।

(৪) পোষণ—ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

(৫) উতি—কর্ম্মবাসনা।

(৬) মন্বন্তর—মন্বন্তরের বর্ণন।

(৭) ঈশানুকথা—ভগবানের অবতার-বর্ণন এবং ভগবানের অনুবর্ত্তী ভক্তগণের কথা।

(৮) নিরোধ—প্রলয় অর্থাৎ সকল শক্তিতে উন্নতি-সহ জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের শয়ন।

(৯) মুক্তি=স্বরূপে অবস্থিতির নাম জীবের মুক্তি।

(১০) আশ্রয়=পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা—যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়।

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থান-পোষণ-মূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্ বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥
স্থিতি বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ।
নিরোধোঽস্যানুশয়নম্ আত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে।"

(ভাগবত ২।১০।১, ৩-৭।)

পুরাণ দশলক্ষণযুক্ত। যথা—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

গুণ তত্ত্বের পরিণামহেতু, একমাত্র কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব, এই সকলের বিরাট্ রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহারই নাম সর্গ। আর ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ। সৃষ্ট জীবদিগের তত্তৎ মর্য্যাদা পালনদ্বারা যে

উৎকর্ষসাধন, তাহার নাম স্থিতি বা স্থান। আর স্বীয় ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহার নাম পোষণ এবং কর্ম্ম-বাসনার নাম উতি। এই উতিই সুকৃতি ও দুষ্কৃতি নিবন্ধন মানবের বন্ধনের হেতু। ও সাধুদিগের যে ধর্ম্ম, তাহার নাম মন্বন্তর। আর ভগবান্ হরির অবতার চরিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী মহাপুরুষদিগের যে সৎকথা, তাহার নাম ঈশকথা। ইহা বিবিধ আখ্যানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ভগবান্ হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে, জীবের আত্ম উপাধির সহিত যে লয়, তাহারই নিরোধ নাম; আর অন্যথা রূপ অর্থাৎ অবিদ্যাদির দ্বারা আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে যে অবস্থিতি তাহারই নাম মুক্তি। যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহাকেই বস্তুতঃ আশ্রয় বলা যায়।"

এইবার আমরা উপক্রমণিকার উপসংহার করিলাম। এইবার আমরা আলোচনা করিব, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ কি? এইবার আমরা দেখিব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব কি? এইবার আমরা দেখিব, প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব কি?

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।